Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 *(Index Copernicus International)*
UGC Approved Journal Serial No. 47694/48666
Volume-VI, Issue-IV, April 2018, Page No. 17-23
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বাংলা কথাসাহিত্যে শাক্ত-তন্ত্রাচারের ধারা

ড.শান্তনু চট্টোপাধ্যায়
সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চন্দননগর কলেজ, কলকাতা, ভারত

Abstract:

'Tradition of Shakta-Tantra in Bengali Literature' under the topic of this essay we starting from the great Bengali Novelist Bankimchandra Chattopadhyay to recent writer such as Gautam Goshdostidar's fiction it has been noticed that the tendency of writing novel and stories in Bengali is influenced by the Shakta-Tantras or the belifs of Tantras. Like the traditional main stream literature, this tendency also present in literature beyond the mainstream or traditional. Some of the authors are devoted to full faith in Shakta-Tantra and others are writing in the context of it. Again some writers base their life experience as the realm of their literature and depict characters and stories.Hence the main theme of this article is to justify the reasons of the success and failure of the trend that is prevailing in Bengali Literature from the nineteenth century to this time. Therefore,this essay is searching a brief history of this tendency and also trying to conclude a deceison about contribution to the Bengali Literature.

(১)

শক্তির উপাসক শাক্ত আর শাক্তের আধার তন্ত্র। তন্ত্রের প্রধান শক্তি বা প্রাণ হলো মহামাতৃকা। শাক্ত তন্ত্রাচারি জ্ঞাণী, সাধক ও দার্শনিকদের থেকে আমরা জানতে পারি যে, মাতৃকা তথা মায়া হলো সৃষ্টি এবং মহামাতৃকা তথা মহামায়া হলো বিশ্ব সৃষ্টিকর্তা। এই মহামায়া বা মহামাতৃকাই হলেন বিশ্বজননী। ইদং জগতের মধ্যে অহং চেতনার ক্রমোন্নতিতে(হার্দকলা[১]) দেহ এবং মনের নিশ্চল অবস্থায় পরমশিবত্বলাভ বা সিদ্ধি ঘটিয়ে জ্ঞাণী ও সাধক চতুর্বর্গ লাভ করেন। জরা ব্যাধি রোগ শোক মৃত্যু প্রভৃতি তখন ভূমাজগৎ থেকে মন মুক্ত-হয়ে চৈতন্য তথা মোক্ষলাভ হেতু 'ভাগবতী সৃষ্টি এবং প্রেমময় জগতের আবির্ভাব'[২]-এ সাধককে এক অপার্থিব আনন্দময় অনুভূতির জগতে নিয়ে যায়। এই আনন্দময় মনোজগতের শক্তি তখন মোক্ষদা বা আনন্দময়ী রূপে শাক্তসাধক বা পণ্ডিতের কাছে প্রতিভাত হয়। হিন্দু শাক্ততন্ত্রে এটি'ই হলো মোক্ষ যা সাধকের চরমতম সাধ্যবস্তু। বৌদ্ধ-তন্ত্রে একেই বলে মহানির্বাণ। বাস্তবিক, শাক্ত-তন্ত্রের আধ্যাত্মিক মত ও দর্শনের সারকথা হলো 'পরমশিবত্ব'[৩] লাভ। পরমশিবত্ব শব্দবন্ধের আর এক পরিভাষা যামল, কারণ পুরুষ ও প্রকৃতির যুগ্ম সত্তার উন্মীলন এক্ষেত্রে আবশ্যিক। অর্থাৎ শিব ও শক্তির যুগ্মভাব বা অভেদ-ধারণা বা অদ্বৈত-ধারণা নিসৃত অর্ধনারীশ্বর সত্তা শাক্ত-তন্ত্রের মূলকথা। বলাবাহুল্য যে, শুধু শাক্ত-তন্ত্রে কেন শিবাদ্বৈতবাদী, শাক্তাদ্বৈতবাদী, বৈষ্ণব সাধনতত্ত্বের সারকথাটিও এই পুরুষ-প্রকৃতির মিলন ধারণা থেকেই আগত। সুতরাং, জাত-পাত-লিঙ্গ-দেবদেবী প্রভৃতি খণ্ডিত চেতনার উর্ধে ঈশ্বরের অদ্বৈত বা যুগ্ম অবস্থান একাধারে 'পরমশিব' ও 'পরাশক্তি'র তত্ত্বকে প্রামাণ্য দেয়। এ'কারণে পরমশিব তত্ত্বজাত শিবাদ্বৈতবাদী ও পরাশক্তি তত্ত্বজাত শাক্তাদ্বৈতবাদীর জন্ম। বলাবাহুল্য যে, বৈষ্ণবধর্ম-দর্শনে আমরা যাকে 'যুগল সাধনা' বলি বা বৌদ্ধ ধর্মের 'যুগনদ্ধ' প্রকারভেদে শাক্ত তন্ত্রে তা 'যামল'। যা আসলে এক সূক্ষ্ম চেতনা-স্তরের উপলব্ধি বা অর্ধনারীশ্বরের মহাশক্তিধর চেতনা অবস্থান। বাংলা সাহিত্যের

যাত্রাপথের শুরু থেকে আমরা দেখতে পাই উল্লেখিত তিনটি প্রধান ধর্মমতের ও দর্শনের গোষ্ঠী সাহিত্য রচিত হয়েছে। চর্যাগীতিকোষ,শাক্ত পদাবলী এবং বৈষ্ণব পদাবলী তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় কথাসাহিত্যে শাক্ততন্ত্রের ধর্মদর্শনের প্রভাব ও রচনা ধারা। কাজেই উনিশ শতকের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা থেকে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত ‘কপালকুণ্ডলা’, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘দেনাপাওনা’, বিভূতিভূষণের ‘অলৌকিক গল্প’, তারাশঙ্করের অনেকগুলি ছোটগল্প,কথাসাহিত্যিক অবধূতের অনেকগুলি উপন্যাস ও ছোট গল্প, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বেশকিছু ভ্রমণ-ভিত্তিক রচনার মধ্যে ‘তন্ত্রাভিলাষির সাধুসঙ্গ’, ‘অবধূত ও যোগিসঙ্গ’, তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী রচিত অসংখ্য রচনার মধ্যে ‘তন্ত্র তপস্যা’, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘কিশোর ও সন্ন্যাসিনী’, সমরেশ মজুমদারের ‘কুলকুণ্ডলিনী’, ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের ‘রুদ্রচণ্ডীমঠের ভৈরব’, সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘যোগিনী’, গৌতম ঘোষদস্তিদারের ছোটগল্প ‘বশীকরণ’ এই এতোগুলি দৃষ্টান্তে প্রাথমিক ভাবে প্রমাণিত যে বাংলা গদ্যরচনা ধারায় শাক্ততন্ত্র সাধনার একটি শক্ত-প্রবাহ রয়ে গেছে। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা রচনা-কালানুক্রমিক ‘কপালকুণ্ডলা’ থেকে ধারা-প্রবেশ করতে পারি।

(২)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯৩৮): ‘কপালকুণ্ডলা’[৪] (১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ) এই উপন্যাসটির অন্যতম প্রধান চরিত্র হলো ‘কাপালিক’। সমুদ্রবেষ্টিত অরণ্যের প্রান্তে নির্জন শ্মশানে নবকুমারকে নরবলি দিতে আগ্রহী বীরাচারি শাক্ত-তান্ত্রিক ‘কাপালিক’ । এ’কারণে নবকুমারকে সে শুরুতে বধ করেনি, নির্দিষ্ট নিয়ম ও প্রক্রিয়ার অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু বাধ সাধল তার পালিতা কন্যা কপালকুণ্ডলা। পথেই তাদের (নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা) প্রথম আলাপ আবার তা শ্মশান প্রেক্ষিতে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে এই দুই নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদও ঘটেছে পথে, শ্মশান প্রান্তে। কাপালিক চরিত্রের মধ্যে আমরা দেখেছি নর-করোটিতে সুরাপাণ, খড়্গ-বলিস্থান-দেবী ভবানীর পূজা এবং নর-বলির স্বাভাবিকতায় পূর্ণ একজন জটাজূট মণ্ডিত রূদ্রাক্ষ মালা শোভিত বিকটাকার মূর্তিকে। চরিত্রটির এই ভয়াল ভীষণ রূপকে শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনির গঠন-প্রক্রিয়াতে পরিবর্তন আনলেন। নির্জন অরণ্যচারী তান্ত্রিক সাধককে নিয়ে এলেন সপ্তগ্রামে, জন্ম-মৃত্যু রহস্য ভেদ ক’রে সিদ্ধিলাভের পরিবর্তে কুচক্রী খল-নায়কের আসনে বসালেন শিল্পী বঙ্কিম। শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’ গ্রন্থে এ বিষয়ে যথার্থ লিখেছেন, ‘আমদের শান্ত, ধর্মাভিভূত জীবনের উপর যদি কখনো কল্পলোকের আলোকপাত সম্ভব হয়, তবে তাহা প্রবল ধর্মোন্মাদের দিক হতেই আসিতে পারে,যুদ্ধের উদ্দীপনা বা প্রেমের উচ্ছ্বাস হইতে নহে। এ জন্য কপালকুণ্ডলার জীবনের উপর যে একটা অসাধারণত্ব আসিয়া পড়িয়াছে,তাহা তান্ত্রিক প্রথার ভীষণতা ও সহজ ধর্মপ্রবনতা হইতে উদ্ভূত বলিয়া আমাদের বাস্তব জীবনের সহিত একটা সুসংহতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে।’[৪খ] বাস্তবিক কপালকুণ্ডলার সংসারবিরক্তি, সমাজ রীতিনীতির ব্যাপারে উদাসীনতা ইত্যাদি শুধুমাত্র অরণ্যে প্রতিপালিত বলেই ঘটেনি, প্রথানুসরণ ও তন্ত্রাচারি কাপালিকের তন্ত্রাচার তার একটি অন্যতম কারণ। পল্লীসমাজ, সামাজিক সম্পর্ক, দিন ও রাতে বাঙালি নারীর চলা ফেরার বিধিনিষেধ, ঘর-বাইরের বিধিনিষেধ প্রভৃতি বিষয়ে কপালকুণ্ডলার নির্বেদ মানসিকতা ছিল বলেইতো নবকুমারকে এমনকি প্রণয় সর্ম্পককে সে বোঝেনি; (বুঝতে চেয়েছিল কি আদতে!)। বীরাচারি কাপালিক নবকুমারকে বলি দেবে বলে যে-শ্মশানের যূপকাঠে বেঁধে রেখেছিল সেই বন্ধন থেকে মুক্ত ক’রে কপালকুণ্ডলা আবার শেষে সেই শ্মশানের প্রেক্ষিতে সমস্ত বন্ধন মুক্ত ক’রে হারিয়ে যায় জল অতলে। সুতরাং কাহিনিটির মধ্যে শ্মশান প্রেক্ষিত, তন্ত্রাচার, দেবী ভবানী প্রভৃতি কথাসূত্র ধ’রে আমরা দেখি উপন্যাসটিতে লেখক কাপালিকের স্ব-ভাবের পরিবর্তন না-ঘটিয়েও শুধুমাত্র তার মধ্যে প্রতিশোধ-বোধটুকু রেখে তন্ত্রাচারের মূল প্রবনতা থেকে সরিয়ে একটি অসাধারণ উপন্যাস উপহার দিলেন বাঙালি পাঠকবৃন্দকে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৮-১৯৩৮): ‘দেনাপাওনা’[৫] (১৯২৩)- এই উপন্যাসে চণ্ডীগড়ের ভৈরবী ষোড়শী নায়িকা চরিত্রে রয়েছে। লেখক ষোড়শী তথা ভৈরবী চরিত্রের মধ্যে প্রথাগত ধারণাকে ভাঙবার জন্যই তাকে গ্রামসীমান্তে স্থাপন করেছেন। সংসার বিচ্ছিন্না বা পলাতকা যুবতী রূপে একে দেখান নি , সে কাহিনি অনুযায়ি বাল-বিধবা। জমিদার জীবানন্দ চৌধুরীর প্রাক্তন স্ত্রী। শাক্ত তন্ত্রানুযায়ী ভৈরবী নান তান্ত্রিক ক্রিয়া-কলাপে জীবন উৎসর্গ করেন। কিন্তু সামাজিকের কাছে তাদের জীবন ও কর্ম বিষয়ে কৌতূহলের সীমা নেই। ব্যভিচারী,ভ্রষ্ট জীবনে শরীর সর্বস্বতা যেন ভৈরবীদের প্রতি মানুষের একটা ভয় মিশ্রিত আগ্রহ একারণে রয়েছে। তদুপরি গ্রাম সীমান্তে পুরুষদের মাঝে ষোড়শীর অবস্থান! এবং লেখক এই চরিত্রের নানা ঘটনা উপঘটনার মধ্যে দেখালেন সাধারণ ধারণার ভেতরে রয়েছে প্রকৃত মানব জীবন ও তার আদর্শ। গ্রামবাসী থেকে শুরু

ক'রে স্বয়ং জমিদার জীবানন্দরও ভ্রম ঘুচল। ষোড়শী তথা চণ্ডীগড়ের সেবায়েত তারাদাস চক্রবর্তীর মেয়ে শেষে অলকা নামে আবিষ্কৃত হলো। লক্ষ্য করুন,অলকা শব্দে লেখক ভৈরবী থেকে সতী বাচ্যার্থে উপনীত হবার মধ্যিখানে রাখলেন মূল কাহিনিটি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০): 'তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প'[৬] 'বীরভূমের এক গ্রামে শুনলাম সেখানকার শ্মশানে এক পাগলী থাকে, সে আসলে খুব বড় তান্ত্রিক সন্ন্যাসিনী। পাগলীর সঙ্গে দেখা করলাম নদীর ধারে শ্মশানে।'[৭] বক্তা তারানাথ তান্ত্রিকের আত্মপ্রেক্ষণে স্বয়ং লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বাস করলেন যে, 'ওসব হাঁকিনীদের মায়া!' 'শ্রীষোড়শী সাক্ষাৎ ব্রহ্মশক্তি।'

'তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প' এর একটি উপ-শিরোনাম রয়েছে, 'মধুসুন্দরী দেবীর আবির্ভাব'[৮]। গল্পটির পাঠক মাত্রেই জানেন যে গল্পে প্রচুর শাক্ত-তন্ত্রের পরিভাষা ও ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা রয়েছে যেমন ছাতিমতলা, পঞ্চমুণ্ডির আসন, যোগিনীতন্ত্র প্রভৃতি। মধুসুন্দরী দেবীকে তারানাথ পেয়েছে, দেখেছ্ এমন-কি লেখক বলছেন, 'তখন বুঝলাম দেবদেবীর ধ্যান মন-গড়া কথা নয়,সাধকে প্রত্যক্ষ না করলে এমন বর্ণনা দেওয়া যায় না।' 'রঙ্কিনীদেবীর খড়্গ' গল্পটির প্রেক্ষিত মানভূম জেলার চোরা গ্রাম। রঙ্কিনীদেবী আসলে 'কালীমূর্তি','অসভ্য বন্য জাতির ঠাকুর'। খড়্গের অলৌকিক রক্তপাতের দ্বারা অশুভকে পূর্বসংকেতে 'সকলকে সর্তক করিয়া দেন মাত্র'। গল্পটির কাহিনি শেষ হচ্ছে 'আমি' এই কথক দ্রষ্টার একটি বিবৃতিতে, 'স্কুল বন্ধ হইয়া গেল। আমি দেশে পলাইয়া আসিলাম,তারপর আর কখনও চেরোতে যাই নাই।'[৯]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯২১) তারাশঙ্করের চারটি ছোটগল্প[১০] সরাসরি শাক্তাচার ও শাক্ত -তন্ত্রের আধারে রচিত। এছাড়া বেশ কিছু গল্পে অল্পবিস্তর প্রসঙ্গ রয়েছে। 'ছলনাময়ী'(বঙ্গশ্রী ১৩৪০) গল্পে কলিয়ারির ম্যানেজার বাবুর অতিপ্রাকৃত শক্তি অর্জনের প্রতি বিশ্বাস ও একারণে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ম্যানেজারবাবুর বিকৃত মনস্ক আচরণ, নানা তান্ত্রিক ক্রিয়ার নামে নরহত্যা এমনকি নিজ পরিবার কন্যার স্বামীকে হত্যা ক'রে সেই শবদেহের ওপর বসে সাধনার ঘটনা বাস্তবিক তাকে পিশাচতুল্য করেছে। লেখক ম্যানেজারের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন। কম্পাসকে হত্যা ক'রে দশ বছর পাগল হবার পরেও ম্যানেজার পুনরায় 'আবার আমি দেখব' বলাতে পাঠক আশ্চর্য হবেন না, কারণ লেখক স্বয়ং কেন্দ্রীয় চরিত্রের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। 'খড়্গ'(ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩৮০) গল্পে সামন্ত-তান্ত্রিক জমিদারি ব্যবস্থার এক নিদারুন শোষণ বঞ্চনার আখ্যানের মধ্যে লেখক তারাশঙ্কর অসাধারণ দক্ষতায় দেখিয়েছেন নিম্ন-বৃত্তিধারী মানুষের প্রতাপের বিরুদ্ধে ব্যক্তি সত্তার জয়কে। দীর্ঘ গল্পটির কাহিনি বুননে লেখক এক পশুছেত্তা যুবক কর্মকারের সঙ্গে রাজা রামজীবন রায়ের সম্পর্ক সূত্রে রাজদেবী দুর্গার('সিংহ বাহিনী') অষ্টমী পুজোর ছাগ বলির দ্বি-চ্ছেদ ঘটনা প্রধান। এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে রাজার শুভাশুভ লক্ষণ বিচার যেহেতু তান্ত্রিক রাজপুরোহিত ও রাজ পরিবারের প্রথাগত সংস্কার সেহেতু উপবাসি কর্মকারের প্রতি রাজাদেশ (শাস্তি বিধান) নেমে আসে। অষ্টমীর বলি-বিঘ্নের প্রতিকার স্বরূপ নেমে আসে আদেশ--'হত্যা কর ---ওই হতভাগ্য ছেত্তাকে ওইখানে বলি দাও।'[১১] সামন্ত-তন্ত্রের এই দর্ভ, অন্যায় বিচার ও বাস্তবিক নিম্ন-শ্রেণির প্রতি রাজ প্রতাপের দুওর্লঙ্ঘ্যনীয় বিচারের আরো এক বাক্য—'মায়ের আমার নরবলি গ্রহণের সাধ হয়েছে।'[১২] আমরা জানি যে, ছেত্তা বেচারা কর্মকার এই আদেশকে কিভাবে গ্রহণ করেছিল। আত্মাভিমানে রাজাদেশ উপেক্ষা ক'রে সে প্রাণ বির্সজন দেয়। কিন্তু গল্পটির এটি আখ্যান মাত্র, গল্পটি পাঠককে টানে যে জায়গায় সেটি ওই যুবকের পরবর্তী প্রজন্মের এক ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করা ও ছেত্তাকর্মে বীতরাগ কামারের সঙ্গে ঢেকা-রাজবংশের আর-এক উত্তর প্রজন্মের সম্পর্ক সূত্রে খড়্গের আত্মকথনে। খড়্গটি তার বিষাদময় জন্ম-কর্মের কথা জানায় এই পরপ্রজন্মের কাছে—'আমায় পূর্ণাঙ্গ করে তুল না বন্ধু, বরং আমার এ জীবনের অবসান করে দাও। আমার বেদনা তো তুমি জান। আমার বেদনার সঙ্গে জন্মান্তর হতে তোমার পরিচয় রয়েছে। তোমার কি মনে পড়ে না? আসলে আড়াইশো বছর আগে মহাতান্ত্রিক এক ব্রাহ্মণ আমার জড় চেতনাকে জাগ্রত করেছিলেন। রাজা রামজীবনের পুরোহিত আমায় মন্ত্র বলে প্রাণবন্ত করেছিলেন।'[১৩] রবীন্দ্রনাথের 'বির্সজন'(১৮৯০) নাটকটির রাজপুরোহিত রঘুপতি আর জয়সিংহের ঘটনা আখ্যান এ'প্রসঙ্গে স্মরণে আসে। 'পুত্রেষ্টি' (প্রবাসী শ্রাবণ ১৩৪২) উচ্চবর্গীয় ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তানহীন 'মেজকর্তা'র উচ্চাকাঙ্খার কারণে জনান্তিকের দুগ্ধপোষ্য পুত্রকে শ্মশানস্থিত এক তান্ত্রিক কাপালিকের নির্দেশে বলি দেবার আয়োজন ও পরিশেষে সেই পরিকল্পনার বিপরীতে যাবতীয় লৌকিক এবং অলৌকিক ঘটনা সমাবেশে মেজকর্তার বিবেক দংশন হেতু চেতনার পুনরুদ্ধার কাহিনিটির মূল আখ্যান বস্তু। 'চণ্ডীরায়ের সন্ন্যাস'(দেশ শারদীয়া, ১৩৪৩) এই গল্পটির কেন্দ্রে রয়েছে অভিজাত ব্রাহ্মণ বংশজ চণ্ডী রায়ের শাক্ত-তান্ত্রিক সাধনাতে উচ্চাকাঙ্ক্ষা হেতু সন্ন্যাস গ্রহণের সিদ্ধান্ত থেকে থেকে বিচ্যুত হয়ে ঘোর সংসারি হবার বৃত্তান্ত। কাহিনিটির বুননে দ্বিস্তর রয়েছে, প্রথম স্তরে আছে চণ্ডী রায়ের উদার-সন্ন্যাস সুলভ বিষয়াসক্তহীন এক মানুষের জীবন দর্শন। আর দ্বিতীয় স্তরে আছে তার প্রথমকার দর্শন যে বাস্তবিক ভ্রমাত্মক বরং প্রভুত্ব,ক্ষমতা, বিষয় ভোগাকাঙ্খা প্রভৃতি

পূর্ণমাত্রায় রয়েছে তার চূড়ান্ত বিষাদময় কাহিনি। পাঠকের হৃদয়ে 'চেনকা' একারণে করুণা ও সমস্ত আগ্রহ টেনে নেয়, তার বিষদময় পরিণতি ও মামা চণ্ডী রায়ের বাড়ি ত্যাগ ক'রে হারিয়ে যাওয়া হৃদয় স্পর্শ করে।

অবধূত(১৯১০-১৯৭৮)[১৪] বাংলা কথাসাহিত্যে কথাসাহিত্যিক অবধূত একমাত্র লেখক যিনি তাঁর প্রায় সমস্ত রচনাতেই শাক্ত সাধক ও শাক্ত-তন্ত্রের সর্ব-ভারতীয় সাধক সমাজের পূর্ণচিত্র উপস্থান করেছেন । তেতাল্লিশটি উপন্যাস এবং তিনটি গল্প সংকলন রচনা করেছেন। 'মরুতীর্থ হিংলাজ', 'উদ্ধারণপুরের ঘাট', 'বশীকরণ', 'নীলকণ্ঠ হিমালয়', 'হিংলাজের পরে', 'কলিতীর্থ কালিঘাট', 'দুর্গম পন্থা' প্রভৃতি উপন্যাসের মূল কাহিনি বস্তুতে রয়েছে শাক্তধর্মের নানা ব্যভিচার আচার অনাচার ও অভিচার। 'মরুতীর্থ হিংলাজ' উপন্যাসটি তাঁর সিগনেচার গ্রন্থ। ১৩৬২ সালে প্রথম প্রকাশিত 'মরুতীর্থ হিংলাজ' আদ্যোপান্ত 'ভ্রমণ কাহিনি' মানলুম কিন্তু এই 'উপন্যাসের' কেন্দ্রীয় আকর্ষণ দেবী হিংলাজ দর্শন-উদ্দেশে এক দল ভিন্ন দেশ সংস্কৃতি ভাষার মানব মানবীর মরুযাত্রায় ভ্রমণের সঙ্গে কাহিনি মিশে গড়ে উঠেছে 'পাতায় পাতায় রসতীর্থ' এই সত্যকে মর্যাদা দিতে হয় সবার আগে। কারণ, সাহিত্যে বাস্তব সত্যের কোনো স্থান নেই, তার স্থান পাঠকের হৃদয়। সুতরাং, ১৯৪৬ সালের ভয়াবহ দেশ ভাগ ও জাতি দাঙ্গার প্রেক্ষিতে সুদূর পাকিস্তান নামক একটি দেশের বেলুচিস্তান প্রদেশে কাবুলিওয়ালাদের সঙ্গে নিয়ে এক দল হিন্দু শাক্তপীঠে ধর্ম-কর্ম করতে কঠিন মরুপথ অতিক্রম করতে যাচ্ছেন এমন নজির বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়টি নেই। মহান্ত মহারাজ ভৈরবী,কুন্তা,থিরুমল,ছড়িদার,পপেটলাল দুই উট-পরিচালক গুলমহম্মদ দিলমহম্মদ প্রমুখ চরিত্রের দ্বারা লেখক ধর্ম অপেক্ষা মানব জীবনের এক শাশ্বত দর্শনকে অনায়াসে বুনে গেলেন। এ জীবন শুধু হেঁটে চলার, থামার বিরাম নেই। থামলেই তুমি শেষ। জয়শঙ্করজি এবং থিরুমলের পথ চলা থেমে গেছে। জীবন যুদ্ধে পরাজিত নায়ক থিরুমল জীবনকে গভীর ভাবে পেতে চেয়েছিল—কুন্তা সেই আশার মরীচিকা। কিন্তু প্রাভব ও গ্লানি তাকে শ্রীরাধা যেমন পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে বিপদসঙ্কুল পথে মিলিত হবার জন্য যাত্রা করে অবধূতের হিংলাজ যাত্রীগণও সেরূপ করাচি থেকে মাকরাণ মরুভূমি অতিক্রম করে। 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' (১৩৬৩) ধর্ম সাধনার গুহ্যাতিগুহ্য রহস্যন্মোচনে মানুষের চিরকালীন ধর্ম ভীরুতার পাশাপাশি এক শ্রেণি ব্যভিচারী সাধক চরিত্রের সত্যাসত্য প্রকাশে অত্যন্ত পারদর্শী লেখক অবধূত এই কাহিনিতে জীবন ও মৃত্যুকে শ্মশান প্রেক্ষিতে সমান্তরাল রেখে অসাধারণ দক্ষতায় বিধৃত করেছেন। বাংলা কথাসাহিত্যে তিনিই এ বিষয়ে সার্থক শিল্পী। 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' কাহিনিটি এক বাস্তব শ্মশান ঘাটকে আশ্রয় ক'রে রচিত। আনুমানিক ১৯৩৭-৩৮ সালে লেখক যখন পুলিশের তাড়া খেয়ে পলাতক ও পূর্ণতান্ত্রিক হয়ে ঘুরছিলেন তখন এই গভীর গাছপালায় ঘেরা ভাগীরথী তীর সংলগ্ন শ্মশানে থাকতেন। উপন্যাসটির শুরু থেকে শেষাবধি শাক্ত-তন্ত্রাচার এবং এতদাঞ্চলের মানুষের জীবন দর্শনকে বুনেছেন। 'আমি' নামের আড়ালে স্বয়ং কথক-নায়ক-দ্রষ্টা শ্মশান-ভৈরব চরিত্রে উপস্থিত আলোচ্য উপন্যাসে। রয়েছে চল্লিশটির অধিক চরিত্র, উপকাহিনিতে রয়েছে ব্রহ্মবিদ্যা আগমবাগীশের তান্ত্রিক যামল সাধনার ঘটনা । রয়েছে মৃত-মানুষের দেহকে নিয়ে মরা-নাচানোর ঘটনা। এই কাহিনির শ্রেষ্ঠত্ব নিতাই-চরণদাস উপকাহিনির সংযোজন। বৈষ্ণবীয় যুগল সাধক নিতাই ও চরণ দাস বীরভূমের আখড়া ত্যাগ ক'রে এই শ্মশানে আসে, কিন্তু নিতাই-এর সাধনা চরণ দাসের অপূর্ণতায় ব্যর্থ হ'তে হ'তে যে বিষাদ গ্রাস করে তা নিতাইকে মহত করলেও শেষ পর্যন্ত সেও ভ্রষ্ট হয়ে যায়। শ্মশান ও মানব জীবন একাকার ক'রে দিয়ে লেখক বাসনা বঞ্চনা কামনাকে নিয়ে আসেন প্রেতভূমিতে। আবার প্রেতভূমির নানা ঘটনা প্রবেশ ক'রে দূরদূরান্তের গ্রাম শহরে। গার্হস্থ্য অনল প্রতিদিনের লীলাময় জীবনকে সচল রাখে, অন্যদিকে শ্মশানের চির জাজ্জ্বলমান অনল গ্রাস ক'রে নেয় সবটুকু। যাবতীয় বাসনা কামনার আগুন তখন চিতানলের চির পাবকশিখায় কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার সঙ্গে আকাশে বিলীন হয়। লেখক এক স্থানে লিখছেন, 'শ্মশান জাগিয়ে যে বসে আছে সেই ত সাক্ষাৎ ভৈরবের চেলা। প্রথমে তার মুখে না উঠলে অপরে এখানে মুখে দেয় কি ক রে! এইভাবেই কেটেছে তখন আমার উদ্ধারণপুরের সেই মধুর দিনগুলি।'[১৫] বলাবাহুল্য উপন্যাসটি নিছক শ্মশান কাহিনি নয়, শাক্ততন্ত্র সাধনার নানা উপকরণে সমৃদ্ধ একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনি। 'বশীকরণ'(১৩৬৩) এই কাহিনিটির দুটি আখ্যান স্তর আছে । প্রথম স্তরে গৃহপলাতক বাঙালি যুবকের সন্ন্যাসী হবার বাসনায় হরিদ্বার,কাশীবাসের অভিজ্ঞতা আর দ্বিতীয় স্তরে, বাংলামুলুকে ফিরে আসার কাহিনি। বাস্তবিক দ্বিতীয়টির বাঁধন শিথিল। কাশীতে ভাগ্যান্বেষণে যুবক সাধুর দেখা ভ্রষ্টাচার মূল আগ্রহের বিষয় । প্রতিটি মানব মনের মধ্যে অবদমিত কাম কি-ভাবে একে অপরকে বশীকরণ ক'রে থাকতে চায় এবং এর ফলে ব্যক্তি চরিত্রের, সম্পর্কের ও পরিবার সমাজের মাঝে কি কি ভাবে নেমে আসে বিপর্যয় তার অসাধারণ বর্ণনা রয়েছে। 'বহুব্রীহি' (ভাদ্র,১৩৬৪) লেখকের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত চতুর্থ গ্রন্থ, এবং প্রথম প্রকাশিত গল্প সংকলন। সর্বমোট পনেরটি ছোটগল্প রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি গল্পে শাক্ত-তন্ত্রাচার বিষয়ে রয়েছে। বিকৃত মানুষের অতি বিকৃত লোভ লালসার প্রতীক বাবু বভ্রুবাহন আকস্মিক 'দণ্ডী মহারাজ' হ'য়ে হিমালয়ের আর্ত মানুষের সেবায় নিয়োজিত হলো। পূর্বনাম ও

পরনামের মধ্যে অর্থগত মিল না-থাকাটায় বহুব্রীহি । অব্যর্থ কবচ গল্পে দেখি তান্ত্রিক জ্যোতিষী এক পুরুষের কামনা পূরণে সফল হলেন ঠিকই কিন্তু, পুরুষটি মুখে যা চেয়েছিল আর মনের গভীরে যা চেয়েছিল তা সম্পূর্ণ আলাদা। 'বাগীশ্বরী' গল্পে হরিদ্বারের সাধুদের মঠ আখড়ার অভ্যন্তরে বয়ে চলা ভ্রষ্টতা ভোগ-লালসার চিত্র আপাত পবিত্রতার আড়ালে কিভাবে বয়ে চলে এবং সাধারণ মানুষের কাছে সাধু-সন্ন্যাসীরা যে পবিত্র জীব হিসেবে প্রতিভাত হ'ন লেখক সেই ধারণাকে, রহস্যকে উদ্ঘাটন করলেন।

প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায়, তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী এই দুইজন লেখক মূলত কথাসাহিত্যিক নন তাঁরা ভ্রাম্যমান সাধক জীবনের বা সাধক সান্নিধ্যের অভিজ্ঞতাকে সরস গদ্যে বর্ণনা ক'রে গেছেন। তথাপি, 'তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ', 'অবধূত ও যোগিসঙ্গ' অসাধারণ আস্বাদ দেয় পাঠক চিত্তে। 'তন্ত্রতপস্যা'ও ঠিক এমনি এক আস্বাদময় রচনা।

(৩)

সাম্প্রতিকালে লিখেছেন এবং এখনও লিখছেন এমন কিছু গদ্য-লেখকদের মধ্যে আমরা আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে পাচ্ছি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কিশোর ও সন্ন্যাসিনী' (আনন্দ পাব), সমরেশ মজুমদারের 'কুলকুণ্ডলিনী' (আনন্দ পাব), ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'রুদ্রচণ্ডীমঠের ভৈরব' (দীপ প্রকাশন), সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যোগিনী' (আনন্দ পাব), গৌতম ঘোষদস্তিদারের ছোটগল্প 'বশীকরণ' (শারদীয়া প্রতিদিন)। কিশোর ও সন্ন্যাসিনী উপন্যাসে বন্ধ্যা নারীর শ্মশানে বসবাস,তন্ত্রাচার ও এক গৃহহীন মাতৃস্নেহহীন বাউণ্ডুলে কিশোরের একত্রে থাকার ভেতর দিয়ে গড়ে ওঠা কিছু ঘটনা আখ্যান মূলত শাক্ত সাধন বিষয়ক। লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আলোচ্য কাহিনিতে দেহকেন্দ্রিক যামল সাধনার ক্রিয়াকে এক পরিণত মানবীর সঙ্গে এক কিশোরের মধ্যে ঘটিয়েছেন। ফলে বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেলেন ঠিকই কিন্তু শিল্প সার্থক হলো কি—এ প্রশ্ন রয়ে গেছে । কারণ, আখ্যানে স্পষ্টত সন্ন্যাসিনী নিজেকে বন্ধ্যা হবার জন্য স্বামী পরিত্যক্তা হবার বেদনা প্রকাশ করেছে ও বুকে দুধ আসে কি-না তা পরীক্ষা করেছে কিশোরের কাছে। 'কুলকুণ্ডলিনী' উপন্যাসে মাতৃগর্ভ নির্বাচনে এক মানব সত্তার এক রাত্রে বিভিন্ন ও বিচিত্র দম্পতির ঘরে প্রবেশ আখ্যানে আসলে সুষুম্নার জগ্রত স্বরূপকেই ধরতে চেয়ে না পাওয়ার ব্যর্থতা প্রকাশিত। 'রুদ্রচণ্ডীমঠের ভৈরব' গ্রন্থে লেখক অবধূতের ব্যক্তি জীবনের একাংশ বর্ণিত। ফলে লেখকের শাক্তাচারপ্রিয় ঘটনাবলীর সঙ্গে গড়ে উঠেছে সত্তর দশকে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের নানা কথা। 'যোগিনী' উপন্যাসটি আধুনিক সময় প্রেক্ষিত ও নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত এক অত্যাধুনিকা নারীর অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা কি-ভাবে অবচেতনে সম্প্রসারিত হচ্ছে এক জটাজূট সন্ন্যাসীর কল্পিত মূর্তির প্রতি তারই মনস্তাত্ত্বিক আকর্ষণ মূল আখ্যান। লক্ষ্যণীয় যে, আধুনিক লেখিকার কাহিনি-বিষয় নির্বাচনেও শাক্ত তন্ত্রাচারী সন্ন্যাসী শুধু চরিত্রে বা চিত্রকল্পেই নয় সরাসরি কাহিনির কেন্দ্রীয় বিষয় ভাবনাতে অত্যন্ত গুরুত্ব নিয়েছে। ফলে, এই উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে দেখি 'সত্যস্কন্ধ' ও 'অযত্নবর্ধিত লিঙ্গ'-শরীরের শাক্তাচারী সন্ন্যাসীর সঙ্গে মিলিত হয় ('একটি কাল্পনিক মিলন'[১৬] পরিচ্ছেদ)। 'বশীকরণ'[১৭] গল্পের প্রেক্ষিত শাক্ত সাধনপীঠ তারাপীঠ-বক্রেশ্বরে। এই গল্পটির রচয়িতা মূলত কবি, ফলে নায়িকা সুলক্ষণার তান্ত্রিক অভিচার ,শ্মশানে তন্ত্রাচারের পূর্ববর্তী ব্যক্তি জীবনে এক যুবতী নারীর চাওয়া পাওয়ার যে কাহিনি উপস্থাপন করেছেন তা ধর্মচেতনাকে ছাপিয়ে জীবনের মৌল জিজ্ঞাসার জন্য পাঠককে গল্পে টেনে নেয়। লক্ষ্যণীয় যে, গল্পকার সুলক্ষণার শরীরি আগ্রহের কারণ ও এ ব্যাপারে তার তীব্র চাহিদাকে তন্ত্রাচার থেকে আলাদা করেছেন, 'কেউ কোনও দিন তার রূপের স্তুতি করেনি। স্বামী তো কখনও ফিরেই দেখেনি তার দিকে। ভৈরবের কাছে ও সুলক্ষণার রূপের কোনও গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু ব্যক্তি মানুষ নির্বাচন করল সব থেকে বিপজ্জনক পথ, যেখানে হাজার হাজার পুরুষ ওত পেতে থাকে সেখানে 'বন্যার জলের মতো যৌবন তার শরীরে অদম্য প্রবাহিত হচ্ছে' জেনেও ভৈরবীর ভেক ধরল।

(৪)

বাংলা কথাসাহিত্যে শাক্ত-তন্ত্রাচারের ধারা শীর্ষক আলোচনা, বিশ্লেষণের মধ্যে আমরা উনিশ শতক থেকে একবিংশ শতকের রচনা ক্রমের প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ ও উল্লেখ্য রচনা সমূহের একটি সুস্পষ্ট ধারার ইতিহাস দেখাতে সক্ষম হয়েছি। এই ধারার মধ্যে লেখকগণের অনেকেই রয়েছেন মূল ধারার ক্ল্যাসিক সাহিত্যিক আবার অনেকে মূল ধারার বাইরে প্রায়-হারিয়ে যাওয়া কথাসাহিত্যিক। কিন্তু এতে বাংলা সাহিত্যে যে গৌরব বৃদ্ধি ভিন্ন অন্য কোনো ক্ষতি হয়নি তা বলা যায়। কারণ,গল্পে বা উপন্যাসে একটি ছোট চরিত্রের যেমন বিশেষ ভূমিকা থাকে গল্পটির রসাবেদনে তেমন একটি ভাষ ও তার সাহিত্যের বৈচিত্র্য বৃদ্ধিতে বিশেষ একটি ধারার বিচিত্র রচনারাজি সেই ভাষা ও তার সাহিত্যকে ভিন্নমাত্রা এনে দেয়। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা দেখেছি যে, শাক্ততন্ত্রের চরিত্র, বিষয়-ভাবনা বা কাহিনি অনুসরণে লেখকগণ সেই উনিশ শতক থেকে অদ্যাবধি ধর্মমতের

উন্মাদনাকে পরিহার ক'রে মানব জীবন দর্শনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। 'কপালকুণ্ডলা' তে একারণে দেখি কাপালিকের তন্ত্রাচার বর্জিত, 'দেনাপাওনা'-য় ষোড়শী ভৈরবী হয়েও ভৈরবী সুলভ তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ থেকে দূরে অবস্থান ক'রে পল্লী-সমাজের মূল স্রোতের যন্ত্রণার সঙ্গে যুক্ত। তারাশঙ্করের গল্পের শাক্ত-তান্ত্রিক চরিত্রে দেখি উচ্চাকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি অনিবার্য নৈতিক পতনকে। বিভূতিভূষণের গল্পে লক্ষ্য করি অলৌকিক ক্রিয়ার প্রতি তীব্র আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও লেখক সুনিপুণ দক্ষতায় ভিন্ন এক চরিত্রের উপস্থাপনে যাবতীয় ধর্মচেতনাকে মানব জীবনের রহস্যময়তার দিকে টেনে আনেন। লেখক অবধূত স্বয়ং ব্যক্তি জীবনে তান্ত্রিক সন্ন্যাসী থাকার ফলে তাঁর জীবনকে দেখার অভিজ্ঞতা, ভারতীয় সাধক সমাজকে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখা এবং সর্ব্বোপরি তিনি ফক্কর-তান্ত্রিক হবার জন্য তন্ত্রাচারের ভ্রষ্টতা স্খলনকে তাঁর গল্প উপন্যাসে অত্যন্ত বাস্তব চিত্রের মতো বিধৃত করতে পেরেছেন। তিনি কোথাও নির্মল ধর্ম সাধনার চিত্র আঁকেন নি, সর্বত্র দেখি ভ্রষ্টতার আবহে গড়া স্থূল শরীরের মানব মানবী। ছদ্মবেশ ভেদ ক'রে উঠে আসে গেরুয়া ধারীর মীনধ্বজ। আধুনিক সাহিত্যের উল্লেখ্য গ্রন্থগুলিতে দেখতে পাই অবদমিত কামনা বাসনা শাক্ত-তন্ত্রাচারের প্রেক্ষিতে এবং মুক্ত ক্ষেত্রে সন্ন্যাসিনীর আবরণ ভেদ হচ্ছে না না জটিল আখ্যানে। অবচেতন স্তরে গড়ে ওঠা অপূর্ণ যৌনতাকে পূর্ণতায় সিদ্ধ করতে দেখি শাক্তাচারের যামল ক্রিয়াকে ব্যবহার করতে । কিন্তু আমরা কি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'য় সেরূপ কিছু পেয়েছি? তারাশঙ্করের গল্পে কি আমরা যৌনতার পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য নারী চরিত্রকে তিনি কি গৃহ পলাতকা করেছেন ? না করেন নি, বিভূতিভুষণও করেন নি। অবধূতও করেন নি। তাঁর নারী চরিত্রগুলি সাধনার পথে ধর্মের নিমিত্তেই প্রবেশ করেছে, নিতান্ত স্বামী পরিত্যক্ত বা বন্ধ্যাত্বের জন্য পলাতক হয়নি। সুতারাং বাংলা কথাসাহিত্যের এই বিশেষ ধারাটির আঙ্গিকগত, শিল্পরূপ-গত এবং সমাজ-ধারণাগত পটরিবর্তনের আভাস আমরা দেখতে পাচ্ছি । এখন দেখার পরবর্তী রচনাগুলিতে এই ধারার কি সংযোগ ঘটে, বা আদতে এ'ধারার প্রবহমানতা থাকে কি-না।

তথ্যসূত্র:

১,২,৩. কবিরাজ শ্রীগোপীনাথ—'তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত-২', 'মাতৃকা রহস্য' অনুচ্ছেদ, ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩,বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।
৪. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র -প্রথম সংস্করণ ১৯৮৬, 'বঙ্কিম রচনাবলী' তুলিকলম ১,কলেজ রো, কল-৯
৪খ. বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী শ্রীকুমার- ৭ম সংস্করণ ২০০৬-২০০৭, 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা লি, কল-৭৩, পৃষ্ঠা-৭১
৫. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র- সপ্তম মুদ্রণ আগস্ট ২০১১, 'শরৎ সমগ্র', আনন্দ পাবঃ প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন,কল-৯
৬. বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ---সেপ্টেম্বর ১৯৯৩, 'অলৌকিক গল্প', মণ্ডল বুক হাউস,৭৮/১,মহাত্মা গান্ধী রোড,কল-৯,পৃষ্ঠা-১৭
৭. তদেব,পৃষ্ঠা-১৭
৮. তদেব,পৃষ্ঠা-১৪০
৯. তদেব,পৃষ্ঠা-৮৫
১০. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর--প্রথম প্রকাশ ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৯৯৮ 'গল্পগুচ্ছ' (প্রথম খণ্ড) সাহিত্য সংসদ,৩২/এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,কল -৯
১১. তদেব,পৃষ্ঠা-২৮৩
১২. তদেব-পৃষ্ঠা-২৮৩
১৩. তদেব-পৃষ্ঠা-২৭৮
১৪. অবধূত—(জন্ম২.১১.১৯১০ মৃত্যু ১৩.৪.১৯৭৮)। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়-এ বাংলা বিভাগে ২০১৭ সালে কথাসাহিত্যিক অবধূতঃ জীবন ও সাহিত্য' শিরোনামে পি. এইচ. ডি উপাধি পান বর্তমান লেখক,এই গ্রন্থ থেকে তাঁর বিষয়ে তথ্য নেওয়া হয়েছে।
১৫. অবধূত- পৌষ ১৩৬৩, 'উদ্ধারণপুরের ঘাট', মিত্র ও ঘোষ পাবঃ প্রাঃ লিঃ,১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,ক ল-৭৩। পৃষ্ঠা-৮
১৬. সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়-'যোগিনী' প্রথম প্রকাশ শারদীয়া দেশ,১৪১৫

১৭. গৌতম ঘোষদস্তিদার—'বশীকরণ' প্রথম প্রকাশ শারদীয়া প্রতিদিন, ১৪১৭

গ্রন্থপঞ্জি:

১. অবধূত - মাঘ ১৪০২, 'ভ্রমণ কাহিনী সমগ্র'/ 'সাধক জীবন সমগ্র' (১৪০৮) মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কল -৭৩।

২. পদ্মবিভূষণ কবিরাজ শ্রগোপীনাথ- -১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩, 'তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত-২' বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, কল -৮৫।

৩. গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল—তৃতীয় মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪১৮, 'কিশোর ও সন্ন্যাসিনী',আনন্দ পাবঃ প্রাঃ লিঃ,৪৫ বেনিয়াটোলা লেন,কল-৯।

৪. গুপ্ত ক্ষেত্র--প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০০৬, 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস-৬', গ্রন্থ নিলয়, ৫৯/১বি, পটুয়াটোলা লেন,কল-৯।

৫. চট্টোপাধ্যায় প্রমোদকুমার- 'তন্ত্রাভিলাষির সাধুসঙ্গ'(১৯৯৮) বিশ্ববাণী প্রকাশনী/ 'অবধূত ও যোগিসঙ্গ'(১৪১৫), মিত্র ও ঘোষ পাঃ প্রাঃ লিঃ।

৬. চট্টোপাধ্যায় রসিকমোহন (সম্পাদিত)—১৯৯৬, 'বৃহৎতন্ত্রসার' নবভারত পাবলিশার্স,মহাত্মা গান্ধী রোড কল-৯।

৭. ব্রহ্ম শ্রীনলিনীকান্ত—১৩৫৪, 'ভারতের অধ্যাত্মবাদ', বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা।

বি.দ্র--- এই লেখাটি ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি ,সম্পূর্ণ নতুন রচনা। 'প্রতিধ্বনি' জার্নালে প্রকাশ উদ্দ্যেশে রচিত।